বাংলাদেশে শহীদ আহমদী

- মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

আল্লাহ্‌তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে। তাই মানুষ তাঁর ইবাদতে নিত্য নিয়ত মগ্ন থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। আর এই ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করা যায়। তাঁর পুরস্কার পাওয়া যায়। আর এই পুরস্কারের মধ্যে অন্যতম হলো শহীদ। পুরস্কারের গুরুত্ব বিবেচনায় শহীদের স্থান অনেক উর্ধ্বে। শহীদের অর্থ শুধু জীবন বিসর্জন নয়, আল্লাহ্‌র পরম সান্নিধ্যে গমন। জড় জীবনের বিনিময়ে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ। নূতন করে জন্ম গ্রহণ। এজন্য আল্লাহ্‌তাআলা পবিত্র কুরআন করীমে বলেছেন – ' যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছেন, তাঁদেরকে তুমি কখনও মৃত মনে করো না। বরং তারা তাদের প্রভুর সন্নিধানে জীবিত এবং তাদেরকে রিয্‌ক দেয়া হচ্ছে' (৩ ঃ ১৭০)। তদুপরি পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার মাঝে আল্লাহ্‌তাআলা যে চারটি নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলোর মাঝে সালেহীয়তের পর শাহদতের মর্যাদাও এই জামাতের সৌভাগ্যবানরা লাভ করে চলেছেন।

হযরত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের ফলে একদিকে যেমন পুণ্যাত্মাগণ কর্তৃক আল্লাহ্‌তাআলার প্রশংসা গানে আসমান জমীন মুখরিত, অন্যদিকে তেমনি অন্ধকারজীবী অসুরের উন্মত্ত মাতনে ধরাতল প্রকম্পিত। আজ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন উজ্জ্বল সূর্যের মত সত্য। এই সত্যের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে মিথ্যাচারী আলেম সম্প্রদায়ের হিংস্রতা, উল্লাস আর জিঘাংসাবৃত্তি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। তারা যুগ-ইমামের অনুসারীদের বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্রের জাল বুনেই চলেছে। দুনিয়া থেকে জামাতে আহমদীয়াকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে তারা ১৯৫৩ সালে পাঞ্জাবে এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিল । তারপরও তারা নিরস্ত হয়নি। আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের উপর একের পর এক পাশবিক নির্যাতন, নিপীড়ন চালিয়ে গেছে । নিষ্ঠুরভাবে অসংখ্য সরলপ্রাণ মানুষকে হত্যা করেছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাসের পাতা খুললেই চোখে পড়ে সেই সব নৃশংস হত্যার লোমহর্ষক কাহিনী। সাহেবযাদা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ, আব্দুর রহমান ও নেয়ামতুল্লাহ খান সাহেবানের নির্মম হত্যার করুণ কাহিনী আজও আমাদের চিত্তকে ব্যথাতুর করে তোলে। সাহেবযাদা আব্দুল লতীফের হাতে পায়ে বেড়ী পরিয়ে শৃঙ্খলিত অবস্থায় রাস্তা পার করে কোমর পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে দিয়ে পাথর ঠুকে ঠুকে কি নির্মমভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে! নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে রুস্তম খান, আফযাল খান খোকার, সাঈদ আহমদ, সুবেদার গোলাম সারোয়ার প্রমুখ ধর্মপ্রাণ আহমদী ভ্রাতাগণকে। করাচীর শুক্কুর এলাকার কামরুল হক, খালেদ সোলায়মান, কুরায়েশী আব্দুর রহমান (আমীর, শুক্কুর জামাত) আর সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডাক্তার আকিল বিন আব্দুল কাদিরকে হত্যা করা হয়েছে প্রকাশ্য দিবালোকে ধারালো কুড়াল আর শাণিত অস্ত্রাঘাতে। কেবল আফগানিস্তান আর পাকিস্তানে নয়, সমগ্র বিশ্বের সর্বত্র এরা চালিয়েছে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর অনুসারীদের উপর নারকীয় নিধনযজ্ঞ। দুর্বৃত্তদের হিংস্র থাবা থেকে বাংলাদেশও বাদ যায় নি । পাঞ্জাব দাঙ্গার দশ বছর পর ১৯৬৩ সালের ৩রা নভেম্বর তারিখে বাংলাদেশের (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহরে অনুষ্ঠিত ৪৭তম সালানা জলসায় তারা হামলা চালিয়ে শহীদ করেছে জামাতের দু'জন নিবেদিত প্রাণ কর্মী জনাব ওসমান গনি এবং জনাব আবদুর রহীমকে ।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাত বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরানো জামাত । পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের অনেক আগেই এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ববঙ্গ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রধান কেন্দ্রে। এরপর কেন্দ্রটি ঢাকাস্থ ৪ নং বখশীবাজার রোডে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু তারপরও জামাত হিসেবে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার গুরুত্ব কমে যায় নি। বরং বাংলাদেশের জামাতগুলোর মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জামাত। এখানে বাংলাদেশের প্রথম ইমারত প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের আহমদীয়া জামাতের ইতিহাসের প্রাণপুরুষ হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহঃ)-এর জন্মস্থান এখানেই। দেশের প্রবীণ ও ত্যাগী আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নীগণের আবাসভূমি এই ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায়। এখানেই অনুষ্ঠিত হতো জামাতের বিশেষ বিশেষ কর্মকান্ড। এই কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে ১৯৬৩ সালের ৩রা নভেম্বরে এখানে অনুষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাতের ৪৭তম সালানা জলসা। মাগরিবের নামাযের পর শুরু হয় অধিবেশন। এমন সময় বিরুদ্ধবাদীরা জলসা কেন্দ্রের চারিদিক থেকে আক্রমণ চালায়। তাদের নেতৃত্বাধীন শত শত সহযোগী মরিয়া হয়ে জলসায় উপস্থিত লোকদের উপর ইট আর পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করতে থাকে। মুষলধারে বৃষ্টির মতো চতুর্দিক থেকে অজস্র ইট পাথরের টুকরো নিক্ষিপ্ত হ'তে থাকে। রক্তাক্ত হয়ে ওঠে সমগ্র জলসা কেন্দ্র। মানুষের আর্তনাদ আর হাহাকারে ভারী হয়ে আসে আকাশ বাতাস। প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন জনাব ওসমান গনি আর জনাব আবদুর রহীম।

শহীদ ওসমান গনি

শহীদ আব্দুর রহীম

বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাসে এ দু'জন হ'লেন প্রথম শহীদ। শহীদ ওসমান গনির জন্মস্থান ছিল মানিকগঞ্জে। তিনি অত্যন্ত নিবেদিত ও জামাতের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। শাহাদত বরণের পর তাঁকে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় সমাহিত করা হয়। আর শহীদ আব্দুর রহীমকে সমাহিত করা হয় তাঁর জন্মভূমি তারুয়ায়। এই হত্যাকান্ডের পরও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহরের গোঁড়া আলেমদের আক্রোশ মেটেনি। তারা শহীদ ওসমান গনির কবরের উপর হামলা চালিয়েছে। পরবর্তীতে জামাতের নিজস্ব অর্থে নির্মিত দ্বিতল মসজিদ। মসজিদ মোবারক জবর দখল করে নিয়েছে এবং মসজিদ ফাতাহ্ হিসেবে নতুন নামকরণ করেছে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের পর বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টি পড়ে সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জামাতগুলোর উপর। আহমদীদের উপর একের পর এক পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে তারা জামাতের মসজিদ জায়গা সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। তারপরও তারা বিরত হয় নি। দীর্ঘদিন পর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সুন্দরবন জামাতের উপর। সুন্দরবন জামাত বাংলাদেশের বৃহত্তম জামাতগুলোর মধ্যে অন্যতম। নিরাপত্তার দিক থেকে সুন্দরবনকে বাংলাদেশের একটি শক্তি শালী ঘাঁটি মনে করা হয়। সুন্দরবন জামাত মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়নের অন্তর্গত। আর এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সামসুর রহমান। তিনিই ছিলেন সুন্দরবন জামাতের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্ট। দীর্ঘদিন ধরে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থাকার ফলে এলাকায় তাঁর ব্যাপক প্রভাব গড়ে ওঠে। প্রেসিডেন্ট আইউব খানের আমলে তিনি টি, কে, (তমঘায়ে খিদমত) খেতাব সহ প্রেসিডেন্টের গোল্ড মেডেল পুরস্কারে ভূষিত হন। ফলে স্থানীয় সরকারের উপর ছিল তাঁর যথেষ্ট প্রভাব। এলাকার কেউ তার সিদ্ধান্ত কিংবা কার্যক্রমের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে সাহস পেতো না। ভাইয়ের একক প্রভাবের ফলশ্রুতিতে জামাতের উপর কেউ কোন আক্রমণ চালাতে সাহস পেতো না। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা থেমে থাকে নি। তারা দেশের বিভিন্ন এলাকার আলেম মৌলবীদের সাথে যোগ-সাজশ করেই চলে। গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় খুলনা জামাতের উপর। সুন্দরবন জামাতের অভিজ্ঞ ও নিবেদিত প্রাণ কর্মী সমন্বয়ে গঠিত খুলনার আহমদীয়া জামাত।

নিরালা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত খুলনা জামাত। ১৯৬৭ সালে বড় ভাই সামসুর রহমানের উদ্যোগে এবং কতিপয় ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এই জামাত। অল্প সময়ের মধ্যে জামাতের কর্মকান্ড সমগ্র শহরে ছড়িয়ে পড়ে। সুন্দরবন জামাত থেকে আগত কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে অতি দ্রুততার সাথে জামাত এগিয়ে যায়। এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে এলাকার বিরুদ্ধবাদী আলেমগণ খুলনা জামাতকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে। নতুন নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এক ঢিলে দুই পাখী শিকার। খুলনা জামাতের কার্যক্রমকে থামিয়ে দিতে পারলে সুন্দরবন জামাতকে পঙ্গু করা সহজতর হবে। তাই বিরুদ্ধবাদীগণ তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে খুলনা জামাতকে বেছে নেয়।

প্রাথমিকভাবে তারা খুলনা জামাতের লোকজনকে উত্যক্ত করা শুরু করে। জামাত কেন্দ্রে গমনাগমনের পথে বাঁধা সৃষ্টি করে। জামাতের ছেলে, মেয়ে নজরে পড়লে তাদের উপর অশালীন মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়। তাদেরকে নানাভাবে উত্যক্ত করে। আড়াল থেকে ইট পাথরের টুকরো ছুড়ে মারে। জামাত চত্বরের ডাব-নারিকেল, আম-জাম পেড়ে নিয়ে যায়। এসব করার একটাই মাত্র উদ্দেশ্য, আর তা হলো আহমদীদের বিরুদ্ধে বিবাদ সৃষ্টির অজুহাত তৈরী করা। আর একবার কোনক্রমে একটা সংঘাত বাঁধাতে পারলে তাদেরকে এই এলাকা থেকে উৎখাত করার রাস্তা তৈরী সহজ হবে। তাদেরকে এলাকা ত্যাগে বাধ্য করা যাবে। সব ধরনের নিপীড়ন, নির্যাতন চালিয়ে যখন কাজ হলো না, তখন তারা বিকল্প পথের আশ্রয় নিলো। তারা আহমদীয়া জামাতের লোকদের বিরুদ্ধে বোমা হামলার মত নারকীয় হত্যাকান্ড ঘটানোর পথ বেছে নিলো। তারা আরও বেছে নিলো জুমুআর নামাযের সময় এই হামলা চালানো হবে। তারা গোপন বৈঠক করে এই হামলার দিন নির্ধারণ করলো ১৯৯৯ সালের ৮ই অক্টোবর জুমুআর দিন।

খুলনা জামাতের খাদেম ও মোয়াযযিন জনাব মমতাজ উদ্দীন আযানের জন্য তৈরী হচ্ছেন। মসজিদে তখনো কেউ আসেন নি। ঠিক এমনি এক নির্জন সময়ে ষড়যন্ত্রকারীরা একটি শক্তিশালী টাইম বোমা মসজিদে রেখে অতি সন্তর্পণে চলে যায়। মুসল্লিগণ একে একে মসজিদে প্রবেশ করে। সবাই সুন্নত নামায সেরে নেয়। জুমুআর খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে যান মসজিদের ইমাম মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব। অত্যন্ত আবেগের সাথে হুযূর (আইঃ)-এর খুতবা দিয়ে চলেন। মুসল্লিগণ তন্ময় হয়ে খুতবা শোনায় মগ্ন। এমন সময় প্রচন্ড আওয়াজে বিস্ফোরিত হলো ষড়যন্ত্রকারীদের পেতে রাখা টাইম বোমাটি। বোমার আঘাতে মসজিদের বেষ্টনী, ছাদ উড়ে যায়। বোমার আঘাতে মুসল্লিদের দেহ খন্ড-বিখন্ড হয়ে যায়। বিশেষ করে সামনে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে চারিদিকে ছিটকে পড়ে। মসজিদের মেঝে রক্তাক্ত হয়ে যায়। মানুষের বুকফাটা আর্তনাদ আর কান্নার ধ্বনি এক মর্মস্পর্শী পরিবেশের সৃষ্টি করে। ঘটনাস্থলে নূর উদ্দীন আর জাহাঙ্গীর শহীদ হন। ধরাধরি করে ডাঃ মাজেদকে হাসপাতালে নেয়ার পর তিনিও মারা যান। এরপর একে একে মহিবুল্লাহ, আকবর হোসেন ও সোবহান মোড়ল শহীদ হন। মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব সহ মোমতাজ উদ্দীন আহমদ, খাদেম, মোয়াল্লেম শেখ

আব্দুল ওয়াদুদ, এনামুল হক রনী, হাফেয মনসুর আহমদ এবং সর্বজনাব আব্দুর রাজ্জাক, ওমর ফারুক, আলী আকবর, মোহাম্মদ আলী মৃধা, আহসান জামীল, মুহাম্মদ নূরুল্লাহ্, চঞ্চল প্রমুখ মারাত্মকভাবে আহত হন। চিকিৎসার জন্য তাদের অনেককে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। মমতাজ উদ্দীন ঢাকায় চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যান। এভাবে মারাত্মক বোমার আঘাতে একে একে সাতজন আহমদী শহীদ হন। আর এই সাত জনের মধ্যে ছয় জনই সুন্দরবন জামাতের সদস্য ও আমাদের নিকট আত্মীয়।

খুলনার এই বোমা হামলা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। হিংস্র বিরুদ্ধবাদী আলেমদের দেশব্যাপী পাতানো নেটওয়ার্কের একটি অংশ মাত্র। তাই একই উদ্দেশ্যে একই সময় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদের দোতালায় একটি টাইম বোমা পেতে রাখা হয়েছিল, যা তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার হওয়ায় বিশাল এক ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্সটি রক্ষা পায়। খুলনায় বোমা হামলার ঘটনাটি তৎক্ষণাৎ বিটিভি, ইটিভি,বিবিসি , ভয়েস অব আমেরিকা সহ দেশে বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং দেশে-বিদেশে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই ঘৃণ্য হত্যাকান্ডের জন্য দেশের সুধী সমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আহমদীদের শাহাদৎ বরণের হৃদয় বিদারক দৃশ্যাবলী বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমগুলো সচিত্র প্রতিবেদনসহ গুরুত্বের সাথে প্রচার করে। সাত শহীদের জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে নীচে তুলে ধরা হলো ঃ

শহীদ ডাঃ আবদুল মাজেদ ঃ ১৯৫৭ সালের ২১ সে জুন দক্ষিণ সাতক্ষীরা জেলাধীন শ্যামনগর থানার মুন্সীগঞ্জে ডাঃ আবদুল মাজেদ জন্ম গ্রহণ করেন। ছোট বেলায় তিনি স্থানীয় স্কুলে পড়াশুনা শুরু করেন। পিতা মেছের আলী গাজী সাহেবের আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় আমার বড় ভাই সামসুর রহমানের শরণাপন্ন হন। বড় ভাই মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সুন্দরবন হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি আব্দুল মাজেদকে আমাদের বাড়ীতে রেখে সুন্দরবন স্কুলে পড়ার সুযোগ করে দেন। এই স্কুল থেকে তিনি প্রথম শ্রেণীতে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর খুলনার সুন্দরবন আদর্শ কলেজ থেকে তিনি গোল্ড মেডেল নিয়ে আই এস সি পাশ করেন। অতঃ পর তিনি লন্ডন থেকে ডি টি এস এ্যান্ড এইচ- এফ আর এস টি এস এ্যান্ড এইচ ডিগ্রি গ্রহণ করেন। তারপর দেশে ফিরে খুলনাতেই চিকিৎসা শুরু করেন।

এখানেই তিনি কতিপয় আহমদী ছেলেকে নিয়ে একটি প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরী এবং " ফযলে ওমর এলার্জি ও এজমা সেন্টার " প্রতিষ্ঠা করেন। শহীদ ডাঃ আব্দুল মাজেদ স্কুলের পাঠ্যাবস্থায় ১৯৭৩ সালে বয়াত নিয়ে আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন। লন্ডনে অবস্থানকালে তিনি হুযূর (আঃ)-এর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান এবং জামাতের কর্মকান্ডের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি খুলনা জামাতের খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ, সেক্রেটারী তবলীগ, সেক্রেটারী ওসীয়্যত এবং মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীমে আলা ও খুলনা মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান সহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি একজন ওসীয়্যতকারী ছিলেন। ডাঃ মাজেদ আজীবন জামাতের খেদমত করে গেছেন। তাঁর বাবা-মা ভাই-বোন কেউ আহমদী ছিলেন না । ফলে পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়। আর তার প্রতিদান হিসেবে তিনি সবাইকে অসুখ-বিসুখে চিকিৎসাসহ অকৃপণভাবে আর্থিক সাহায্য করে গেছেন, যথাসাধ্য সেবা যত্ন করেছেন। তিনি গরীব-দুঃখীদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করেছেন। শহীদ ডাঃ মাজেদ আমরণ জামাত ও মানবতার সেবা করে গেছেন। তিনি শাহাদাৎ বরণ কালে সেলিনা ববি ও তাহেরা রাফা নামে দুই কন্যা সহ স্ত্রী কোরায়েসা লিলিকে রেখে যান। তার স্ত্রী একজন ধর্মপ্রাণ মহিলা। তিনি স্বামীর স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে জামাতের সেবা করে যাচ্ছেন।

শহীদ জি এম মুহিবুল্লাহ ঃ ১৯৬৯ সালের ১৩ই আগষ্ট সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানাধীন যতীন্দ্র নগর গ্রামে জি. এম. মুহিবুল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করে। তার বাবা জি এম মতিউর রহমান একজন প্রাক্তন সরকারী স্কুল শিক্ষক। আমার শ্বশুর সামাদ আলী গাজী সাহেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা রিজিয়া বেগম ছিলেন মুহিবুল্লাহ্‌র মা। ১৯৬৩ সালে অনুষ্ঠিত ঈদুল ফিতরের দিনে তাঁর বাবা সহ আমরা ৩০ জনের অধিক যুবক এক সঙ্গে বয়াত নিয়ে আহমদীয়া জামাতে সামিল হই। এর প্রায় ছয় বছর পর শহীদ মুহিবুল্লাহ্‌র জন্ম । সামাদ আলী গাজী সাহেবের গৃহাঙ্গণে অবস্থিত ছিল শত বছরের পুরানো এবং এলাকার একমাত্র জামে মসজিদটি। গাজী সাহেবের বয়াত গ্রহণের পরপরই এই মসজিদটি আহমদীয়া জামাতের অধীনে চলে আসে এবং মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত হয় আহমদীয়া জামাতের কার্যালয়। ফলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হতেই মুহিবুল্লাহ সহ তাদের গোটা পরিবার আহমদীয়া জামাতের সরাসরি সাহচর্যে আসে। সাত ভাই বোনের মধ্যে মুহিবুল্লাহ্ ছিল দ্বিতীয়। সুন্দরবন হাই স্কুল থেকে এস এস সি এবং খুলনার আজম খান কমার্স কলেজ থেকে বিকম পাশ করে সে কর্মজীবনে প্রবেশ করে। মুহিবুল্লাহ ছিলো জামাতের কাজ কর্মে নিবেদিত প্রাণ। আতফাল থেকে শুরু করে খোদ্দাম পর্যায়ে সে জামাতের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে। মুহিবুল্লাহ্ খুলনা জামাতের সেক্রেটারী ওয়াকফে

নও, সেক্রেটারী এশায়াত এবং বৃহত্তর খুলনা -বরিশাল এলাকার রিজিওনাল কায়েদ ছিলো। তার নিয়ন্ত্রণাধীন মজলিস ১৯৯৭ – ৯৮ বর্ষের শ্রেষ্ঠ রিজিওনাল মজলিস হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সে ছিল একজন সুবক্তা, ক্রীড়াবিদ এবং দক্ষ সংগঠক। মুহিবুল্লাহ্ ১৯৯২ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সালানা জলসায় যোগদান করে। সেখানে হুযূর (আইঃ)-এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। শাহাদৎ কালে সে তার মা, বাবা , ভাই , বোন ও স্ত্রীসহ একমাত্র কন্যা সুফিয়া খিলাত (ওয়াকফে নও)-কে রেখে যায়।

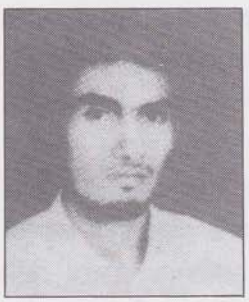

শহীদ নুরুদ্দীন আহমদ ঃ ১৯৭০ সালের ২৪ অক্টোবর সাতক্ষীরা জেলাধীন শ্যামনগর থানার ভেটখালী গ্রামে নুরুদ্দীন আহমদ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সেকেন্দার হায়াতের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তার দাদা সূফী সকিম উদ্দীন ছিলেন সুন্দরবন এলাকায় প্রথম আহমদীয়তের বাণীবাহক। ১৯৪৩ সালে শ্যামনগর থানায় আগত মীর্যা আলী সাহেবের নিকট থেকে তিনি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের পয়গাম পান এবং সুন্দরবন এলাকার ঘরে ঘরে তা প্রচার করেন। সূফী সাহেবের সুদীর্ঘ কয়েক বছরের প্রয়াস ও নিরলস প্রচারের ফলে ১৯৬২ সালে সুন্দরবন এলাকায় আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। বয়াত গ্রহণের পর প্রায় অধিকাংশ সময় তিনি আমাদের বাড়ীতে আমাদের সঙ্গে কাটান। তিনি তাঁর গৃহাঙ্গণে আহমদীয়তের ভিতকে মজবুত করার উদ্দেশ্যে অনেক ঘোরাঘুরি করে পশ্চিম বাংলার এক বুযূর্গ আহমদীয়া পরিবারের মেয়ে মনোয়ারা বেগমের সাথে পুত্র সেকেন্দার হায়াতের বিয়ে দেন। এই মনোয়ারা বেগমের গর্ভজাত সন্তান শহীদ নুরুদ্দীন আহমদ। শহীদ নুরুদ্দীন ছিলেন বাবা মায়ের মতো শান্তশিষ্ট আর দাদার মতো ধর্মানুরাগী। সকলের সাথে অনায়সে মিশে যাবার একটা সহজাত গুণ ছিল তার স্বভাবের মধ্যে। নুরুদ্দীন বি এ পাশ করার পর খুলনায় আসেন এবং এখানে একটি ফার্মে চাকুরী নেন। ছোট বেলা থেকে তিনি জামাতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। নেযামের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল অবিচল আর জামাতের কাজে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তিনি ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। তার নযম পাঠ আর কুরআন তেলাওয়াত সবাইকে মুগ্ধ করতো। আশৈশব জামাতের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। খুলনা মজলিসের কায়েদ, জেলা কায়েদ হিসাবে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার দাবীদার। তার নিয়ন্ত্রণাধীন মজলিস ১৯৯৭ –৯৮ সালের শ্রেষ্ঠ মজলিস হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। শাহাদাত বরণের পূর্বে নুরুদ্দীন ছিলেন খুলনা জামাতের সেক্রেটারী পদে সমাসীন। মৃত্যুকালে তিনি তার বাবা মা ভাই বোন সহ স্ত্রী রেহানা পারভীনকে রেখে যান।

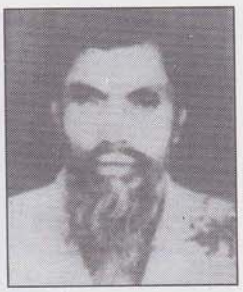

শহীদ সোবহান আলী মোড়ল ঃ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার যতীন্দ্র নগর গ্রামের মোড়ল পরিবারে সোবহান মোড়ল জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবা বাছের মোড়ল ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। তিনি গাজী বাড়ীর মসজিদের মোয়ায্যিন ছিলেন। মসজিদটি পরবর্তীতে আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ তাঁর হয়ে ওঠে নি। তার পুত্র নূর আলী মোড়ল এবং সোবহান আলী মোড়ল হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাবীর প্রতি আস্থাবান হয়ে বয়াত গ্রহণ করেন। সোবহান আলী মোড়ল সামান্য লেখাপড়া করার সুযোগ পান। তবে তার ধর্মীয় জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি ছিলেন একজন উত্তম দায়ীইলাল্লাহ্।

দেহাতী মোয়াল্লেম হিসেবে তিনি সমগ্র খুলনা যশোর এলাকায় তবলীগ করে বেড়িয়েছেন। সাতক্ষীরা ও যশোর এলাকার খেলার ডাঙ্গা, চৌগাছা ,ঝাউ ডাঙ্গা, রঘুনাথপুর বাগে ব্যাপক তবলীগ করেন। তাঁর জোরালো যুক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে খেলার ডাঙ্গার আল্হাজ্জ মনিরুদ্দীন আহমদ সহ অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি বয়াত নিয়ে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হন। নিজের জীবনের উপর ঝুঁকি নিয়ে তিনি তার তবলীগের দায়িত্ব পালন করেন। শহীদ হওয়ার এক মাস পূর্বে সাতক্ষীরার চৌগাছায় তবলীগ করতে গিয়ে বিরুদ্ধবাদী মৌলবীদের হাতে তিনি দৈহিকভাবে অমানুষিক নির্যাতিত হন। তার চোখ নষ্ট হয়ে যায়। অচৈতন্য অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সুস্থ হয়ে উঠতে না উঠতে খুলনা থেকে মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব এক তবলিগী সফরে সোবহান মোড়ল সাহেবকে সঙ্গী করার জন্য খুলনায় তাকে তলব করেন। খুলনায় পৌঁছে সোবহান সাহেব জুমুআর নামাযে শরীক হন এবং বিরুদ্ধবাদীদের বোমার আঘাতে শহীদ হন।

শহীদ সোবহান মোড়লের অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল ছিল না। সামান্য এক খন্ড জমির উপর ছিল তার বসত গৃহ। কিন্তু তাঁর হৃদয়ের বিস্তৃতি ছিল বিশাল। তিনি দেখলেন, তাঁদের বড় ভেটখালী হালকায় কোন মসজিদ নেই । দূর পথ পায়ে হেঁটে সুন্দরবন জামাতের কেন্দ্রীয় মসজিদে যেতে হয়। এখানে একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য অনেকেই জায়গা দান করতে উদ্গ্রীব। কিন্তু সুবহান মোড়ল পিছিয়ে থাকতে চান না। কাল বিলম্ব না করেই তিনি তার বাড়ীর রাস্তা সংলগ্ন পাঁচ কাঠা উত্তম জমি মসজিদ নির্মাণের জন্য জামাতের বরাবরে সাফ কবালা রেজিষ্ট্রি করে দেন। তাঁর শাহাদত বরণের পরপরই সেখানে নির্মিত হয়েছে সুরম্য পাকা মসজিদ। শহীদ সুবহান মোড়লের নাম অনুসরণে মসজিদের নাম রাখা হয় "শহীদ বায়তুস্ সুবহান মসজিদ "।

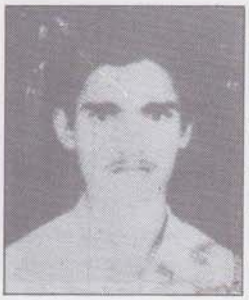

শহীদ জাহাঙ্গীর হোসেন ঃ ১৯৭৫ সালের ২২ শে নভেম্বর খুলনা জেলার কয়রা থানাধীন দেয়াড়া গ্রামে শহীদ জাহাঙ্গীর হোসেন জন্ম গ্রহণ করে। বাবার নাম জনাব আকবর হোসেন। তার মা শাহেদা বেগম হলো আমার মেঝ ভাইয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ভাই-বোনদের মধ্যে জাহাঙ্গীর ছিল সবচেয়ে মেধাবী। জাহাঙ্গীর খুলনায় লেখাপড়া করে। বি কম পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য সে প্রস্তুত হয়। একই সঙ্গে জামাতের কাজ-কর্ম চালিয়ে যায়। যশোর খুলনার জেলা-মোতামাদের দায়িত্ব ছিল তার উপর ন্যস্ত। যথেষ্ট দক্ষতা সহকারে সে তার দায়িত্ব পালন করে। জাহাঙ্গীর ছিল স্পষ্টভাষী, দৃঢ়চেতা এবং সদালাপী। এ ছাড়া সে ছিল একজন উত্তম দায়ীইলাল্লাহ্। জামাতের কাজ , ব্যক্তিগত পড়াশুনা ছাড়াও সে তার বাবামায়ের কাজে সাহায্য করতো। ধর্মের প্রতি তার ছিল গভীর অনুরাগ। জুমুআর দিন তড়িঘড়ি করে জুমুআর নামাযে অংশ নেয়।

একান্ত মনোনিবেশ সহকারে জুমুআর খুতবা শুনতে থাকে। এমন সময় নর ঘাতকের অতর্কিত বোমার আঘাতে জাহাঙ্গীর শহীদ হয়। শহীদ জাহাঙ্গীর ছিল বাবা মায়ের ভরসার স্থল আর জামাতের একজন উদীয়মান, বিশ্বস্ত ও আত্মনিবেদিত কর্মী ।

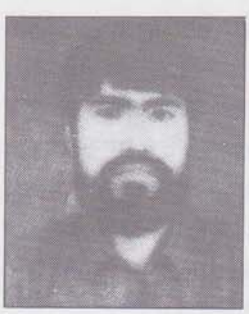

শহীদ জি এম আকবর হোসেন ঃ খুলনা জেলার পাইক গাছা থানাধীন মটবাড়ী গ্রামের জনাব আবু বকর সিদ্দিকের পুত্র জি এম আকবর হোসেন। বি এ পাশ করার পর তিনি একটি হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

এর পর চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে সরকারের সেটেলমেন্ট অফিসে আমীনের পদে যোগদান করেন। শহীদ আকবর হোসেন ১৯৯৭ সালে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের সত্যতাকে স্বীকার করে আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন। আহমদীয়া জামাতভুক্ত হওয়ার ফলে আত্মীয় ও পরিচিত মহল হ'তে তিনি তুমুল বিরোধিতার মুখোমুখি হন। কিন্তু তাঁর ধর্মবিশ্বাসে তিনি ছিলেন অটল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদাশয়, বন্ধুবৎসল ও সেবাপরায়ণ। মানুষ তার আচার-আচরণে সহজে আকৃষ্ট হতো। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবাই ছিল তার আপনজন। তাই তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে কেউ দীর্ঘক্ষণ টিকতে পারতো না। তিনি শাহাদাত বরণের সময় সোহাগ আর ফয়সাল নামে দুই সন্তান সহ স্ত্রীকে রেখে যান। তার স্ত্রী ও সন্তানেরা শহীদ বাবার আদর্শ অনুসরণ করে জামাতের নিয়মিত কাজ-কর্মে নিয়োজিত আছে।

শহীদ মমতাজ উদ্দীন গাজী ঃ সাতক্ষীরা জেলাধীন শ্যামনগর থানার হরিনগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন মমতাজ উদ্দীন গাজী। মেঝ বুবুর নাতনীর সঙ্গে তার বিয়ে হবার পর থেকে তিনি জন্মভূমি হরি নগর ত্যাগ করে আমাদের যতীন্দ্র নগর গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি ১৯৬৭ সালে বয়াত নিয়ে জামাতে আহমদীয়ায় দাখিল হন এবং সুন্দর বন জামাতের মোয়ায্যিন ও খাদেম হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৭৫ সালে আমি যখন ঢাকায় বাংলাদেশ জামাতের কাজ-কর্মে সম্পৃক্ত হই, তখন মমতাজ আহমদকে ঢাকায় নিয়ে আসি এবং তিনি দারুত তবলীগের খাদেম এবং মসজিদের মোয়ায্যিনের কাজে নিয়োজিত হন। এখানে বেশ কিছুদিন বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করার পর তিনি খুলনা জামাতের খাদেম ও মোয়ায্যিন হিসেবে খুলনা জামাতের দায়িত্বে যোগ দেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন খুব সৎ এবং জামাতের একনিষ্ঠ কর্মী। সুন্দরবন জামাতের কাজ করার সময় তিনি মুরব্বী সেলসেলা মাওলানা মুহিবুল্লাহ্ সাহেবের কাছে হোমিও প্যাথিক শাস্ত্রে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। ফলে জামাতের নিয়মিত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি হোমিও চিকিৎসাও করতেন। এছাড়া নির্দ্বিধায় তিনি মানুষের ফুট-ফরমায়েস পালন করতেন। এভাবে কঠোর পরিশ্রমের ভেতর দিয়ে তিনি খুলনার বুকে নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতেন এবং জামাতের দায়িত্ব পালন করে যেতেন। বিরুদ্ধবাদীর বোমার আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে তিনি ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে আমি তার মুখে হাসি দেখেছি। আমাকে জড়িয়ে ধরে তিনি বলেছিলেন ঃ 'নানা, আমি সুস্থ হয়ে উঠে আবার আযান দেব। জোরে চীৎকার দিয়ে বলব মমতাজ মরে নি। মমতাজ মোয়ায্যিন মরতে পারে না । দস্যুদের বোমার আঘাতে আমার ঈমান আরও মজবুত, আরও শক্তিধর হয়েছে।' আল্লাহ্তাআলা মমতাজের জন্য শাহাদতের পুরস্কার মঞ্জুর করে রেখেছিলেন। তাই হাসপাতালে মমতাজ শাহাদত বরণ করেন ২৩শে অক্টোবর, রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে। খুলনার বোমা হামলায় শাহাদাত বরণকারী সাত জনের মধে ছয় জনই সুন্দরবন জামাতের সদস্য আর তাদের সবাইকে সমাহিত করা হয়েছে সুন্দরবন জামাতের নিজস্ব কবরস্থানে। শহীদ জি এম আকবর হোসেনের পরিবারের অনুরোধক্রমে তাকে তাদের পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। আহমদীয়া জামাত কোনদিন এসব মহান শহীদ ভাইদের কথা ভুলবে না, ভুলতে পারে না। জামাতের ইতিহাসের পাতায় এসব শহীদদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।